চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার প্রসঙ্গ*

অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের নির্দেশনা (ধারা ৫৯) অনুযায়ী, অত্যন্ত প্রাচীন ও কার্যকর 'প্রশাসনিক একক' হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার গঠন ও কার্যকর করা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এ বাধ্যবাধকতা জেলা ও বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই দুই স্তরের প্রশাসনিক এককের বিষয়টি বর্তমান আলোচনার এ পর্যায়ে উহ্য রেখে সময়ের দাবি হিসেবে উপজেলা পরিষদ নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। তবে পুরো আলোচনাকে এখানে তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত করা হলো। প্রথম অংশে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকেন্দ্রিক নানা বিষয়; দ্বিতীয় অংশে বিদ্যমান (ত্রুটিযুক্ত) আইনের অধীনে বিভিন্ন নির্বাহী আদেশে পরিবর্তনযোগ্য বিষয়াদির একটি তালিকা সুপারিশসহ সংযোজিত এবং তৃতীয় অংশে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো।

(এক)

চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতির নানামুখী বিতর্ক

চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনটা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি'র মত। দাবি করার পূর্বেই অকস্মাৎ তফসিল ঘোষণা। এখনও জাতীয় রাজনীতির দুর্বহ ও দুঃসহ স্মৃতি সবাইকে তাড়িত করছে। বিশেষত, ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক নানামুখী সহিংসতায় চাপা পড়ে আছে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বিতর্কিত অনেক বিষয়। অতীতে সকল সামরিক শাসকগণ 'বিরাজনীতিকরণ'-এর অন্যতম একটি কৌশল হিসেবে স্থানীয় নির্বাচনকে ব্যবহার করেছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সাময়িকভাবে মুখ রক্ষার মত (face saving) সফলতাও পেয়েছেন। স্থানীয় নির্বাচনের টোপ দিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনা প্রশমনের সাময়িক দম নেয়ার ফুরসত (breathing space) সৃষ্টি করেছেন। জেনারেল আইয়ুব, জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ সবাই একই কৌশল ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয় সরকারগুলো কিছুটা ব্যতিক্রম। স্থানীয় সরকারকে নিয়ে তাদের রাজনীতির কৌশলটা কখনই খুব একটা 'বুদ্ধিদীপ্তভাবে রাজনৈতিক' (Politically Intelligent) ছিল না। এবারেই প্রথমবারের মত একটি বড় রাজনৈতিক দল বা জোট জাতীয় রাজনীতির দাবার ছকে স্থানীয় সরকারের একটি বাস্তব অবস্থান দেখতে পেয়েছেন। ক্ষমতাসীন মহাজোট দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচন বর্জনকারী অপর জোটের রাজনীতি মোকাবেলায় এবারের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেছেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। তবে নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে 'সকল ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়ার' তত্ত্বটি বোধ হয় এখানেও প্রযোজ্য। বিরোধী জোটও পাল্টা কৌশল হিসেবেই এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এতে করে এক দেড় মাস পূর্বেকার উত্তপ্ত কিন্তু অংশগ্রহণবিহীন যে নির্বাচনী চিত্র তা পুরোপুরি বদলে গিয়ে একটি ইনক্লুসিভ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখন সরকার এবং নির্বাচন কমিশন আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে বিষয়টি গ্রহণ করলে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু স্থানীয় নির্বাচনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

এ নির্বাচনের ইতিবাচকতা

স্থানীয় নির্বাচন হলেও এ নির্বাচন একদিকে জাতীয় রাজনীতির একটি টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। প্রথমত সকল দলের অংশগ্রহণে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফল, ভোটের হার এবং প্রার্থী সংখ্যার বিচারে এ নির্বাচন রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ নিয়ে আসতে পারে। অপরদিকে উপজেলা পরিষদের ধারাবাহিকতা এ নির্বাচনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত দশ বছর ধরে পর পর দু' বার উপজেলা পরিষদ মেয়াদ পূর্ণ করতে পারলে এ পরিষদের কার্যক্রমে স্থিতিশীলতা আসবে। ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতার বাইরের সকল দলের স্থানীয় নেতৃত্বে সাংগঠনিকভাবে নিজেদের সংহত করার সুযোগ নিচ্ছে, পাচ্ছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা জাতীয় রাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তনের সূযোগ সৃষ্টি করবে। এ গুণগত পরিবর্তনের প্রধানতম দিক হবে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন এবং এ পরিষদের ধারাবাহিকতা রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের প্রশিক্ষিত নেতৃত্ব সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। সে হিসেবে জাতীয় নেতৃত্ব কাঠামোয় ইতিবাচক ও গঠনমূলক নেতৃত্বের বিকাশ সম্ভব হবে। ঢাকামুখী ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৃণমূল থেকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

গ্রামে গঞ্জে জোটের বাতাস এখন প্রবল। প্রার্থী-সমর্থকদের উৎসাহ বিপুল। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা গেলে এ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর অংশগ্রহণ ৭০% ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে ইতোমধ্যে সরকারের বাইরের দলগুলো থেকে গুম, খুন ও ধরপাকড়ের অভিযোগ উঠছে। সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সরব ও সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে চাইবে জাতি।

নির্বাচন কমিশন ও সরকার

চারশ সাতাশিটি উপজেলার তিনটি পদের নির্বাচন পাঁচ/ছয় ধাপে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রথম ধাপে ৯৮ উপজেলায় ১৯ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় ধাপে ১১৭ উপজেলায় ২৭ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় ধাপে ৮৩ উপজেলায় ১৫ মার্চ এবং চতুর্থ ধাপে ৯২টি আসনে ২৩ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পরবর্তীতে আরও দুই ধাপে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সকল উপজেলার নির্বাচন সম্পন্ন হবে। একাধিক ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীসহ সরকারের নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ওপর চাপটা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। তাই আশা করা যায়, আচরণবিধি মেনে চলা এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি কম। তবে সর্বোচ্চ সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই। আশাকরি সরকার ও নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের করণীয় সম্পর্কে জাতি এখনও সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না। নিম্নের কয়েকটি বিষয়ে তাদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

(১) সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ করার জন্য এ পর্যন্ত নেয়া পদক্ষেপগুলো নিয়ে কমিশন সরব এবং সক্রিয় নয়। তাদের নেয়া পদক্ষেপগুলোর ওপর প্রচার প্রচারণা চোখে পড়ছে না, যা তাদের করা উচিত।

(২) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রত্যেকটি উপজেলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও একক প্রার্থী নির্ধারণের জন্য রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য কোনো কোনো প্রার্থীকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার শামিল, যা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন। আইন পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হচ্ছে না।

(৩) মন্ত্রী, এমপিরা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিলে সেটি আচরণ বিধির লঙ্ঘন কি না, সে বিষয়েও বক্তব্য নেই। কারন তারা 'প্রটোকল' নিয়ে ওসি, ইউএনওসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও বিচরণ করছেন।

(৪) নির্বাচন কমিশন কানে তুলো এবং পিঠে কুলা বেঁধে প্রার্থীদের দেয়া হলফনামাগুলো বেমালুম হজম করে আছেন। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামার তথ্য এখনও তারা ওয়েবসাইটে পুনরায় ফিরিয়ে দেননি। ইতোমধ্যে দেরিতে হলেও উপজেলা পরিষদের তথ্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। এ কাজটি আরও দ্রুততার সাথে হওয়া উচিত। না করা হলে তা আদালতের নির্দেশনার সুস্পষ্ট লংঘন এবং ভোটারের অধিকার হরণ হিসেবে গণ্য হবে।

(৫) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল অনুযায়ী, প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামার তিন কপি নির্বাচন কমিশনে জমা করা আবশ্যক। এরমধ্যে এক কপি নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগণকে কপি করে নেওয়ার জন্য প্রদান করার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রথম দফা নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা পেতে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয় এবং সম্পদের তুলনামূলক চিত্র প্রস্তুত করে সময়মতো ভোটারদের মাঝে বিতরণ করা দূরুহ হয়ে পড়ছে। শুধু সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা নয়, তথ্যভিত্তিক ভোটার ক্ষমতায়নেও নির্বাচন কমিশনকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

(৬) নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য ভোটারদের সময়মতো না পৌছানো তথ্য অধিকার আইনেরও লঙ্ঘন। এ বিষয়ে জাতীয় তথ্য অধিকার বিষয়ক কমিশন এবং নির্বাচন কমিশনের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ আশা করি। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এ বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নাগরিক সমাজ আশা করতে পারে।

নির্বাচনই শেষ কথা নয়

দু'দুবার ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৮৫ সনে জেনারেল এরশাদের সরকার সকল রাজনৈতিক দলের বয়কটের মধ্যেও উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন 'দলছুট' নেতারা এ নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদের নতুন দলে শামিল হন। কিন্তু পরিষদ হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নীতিগত গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়। শুরু থেকেই এ পরিষদের গঠন, কর্মপ্রক্রিয়া, নেতৃত্বের ধরন, সরকারি কর্মকর্তা-জনপ্রতিনিধি সম্পর্ক, কেন্দ্রীয়-স্থানীয় সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু বিষয় ছিল অমীমাংসিত। দ্বিতীয় মেয়াদে ১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলকভাবে নির্বাচিত সরকার ও দলগুলো উপজেলা নিয়ে অত্যন্ত দুঃখজনক নিরবতা অবলম্বন করেন। ১৯৯১ সালে গঠিত বিএনপি সরকার দ্বিতীয় উপজেলা পরিষদ বাতিল করেন। আদালতের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে পর পর গঠিত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকার উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার আর পুনর্গঠিত করেনি। ২০০৭-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অধ্যাদেশের অধীনে নানা বিতর্কের ভেতর দিয়ে উপজেলা পরিষদ ফিরিয়ে আনে এবং ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর পর ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসেই উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালে আওয়ামী সরকার উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করে কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠান করে উপজেলা পরিষদ গঠন থেকে বিরত থাকে।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে কিন্তু উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল এ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই ঘোষিত হয়। ক্ষমতা গ্রহণ করে নতুন সরকার পরিষদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ২০০৯ থেকেই এক ধরনের 'সদয় অবহেলা' প্রদর্শন করে যেতে থাকে। পূর্বতন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করা উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশগুলো বাতিল করে দেন। ১৯৯৮ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন পুনর্বহাল করা হয়। যেখানে জাতীয় সংসদ সদস্যর নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি কর্মচারী এবং স্থানীয় পরিষদের সম্পর্ককে জটিলতর করে দেওয়া হয়। ফলে পাঁচ বছর সময়ের প্রথম দুই বছর প্রতিটি উপজেলায় ভীষণ রকমের উতাল পাথাল অবস্থা সৃষ্টি হয়। তৃতীয় বছর থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়, তবে তা এক ধরণের পারস্পরিক কৌশলগত সমঝোতা। সত্যিকার অর্থে পরিষদ ব্যবস্থা প্রত্যাশিত মাত্রায় কার্যকর হয়নি। জাতীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-সংসদ সদস্য-ইউএনও, চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নানামুখী দ্বন্দ্বে পরিষদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোরকমে মেয়াদ পূর্ণ করলেও কিন্তু প্রকৃত অর্থে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। বিদ্যমান ত্রুটিযুক্ত আইন ও প্রশাসনিক অস্পষ্টতার ধারাবাহিকতায় নির্বাচন প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। নির্বাচনের সাথে যুগপৎভাবে আইন কানুন, বিধিবিধান এবং এ যাবত জারি করা সার্কুলার ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না আনলে দ্বিতীয় মেয়াদেও এ পরিষদ প্রত্যাশিত মাত্রায় কার্যকর হতে পারবে না।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান, স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রকৃত স্থানীয় মানুষের কাছে পৌছানো এবং তৃণমূলের মানুষের জীবন জীবিকায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উপজেলা পরিষদকে সচল করতে হবে। উপজেলা পরিষদের সাথে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সহায়ক সম্পর্কর উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন, সরকারের নীতি নির্ধারণে পরিবর্তন এবং বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আমূল পুনর্বিন্যাস। আইনের

পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। আইন ও কাঠামো পরিবর্তন সম্বলিত পৃথক একটি সুপারিশপত্র পৃথকভাবে সংযোজিত করা হলো। তবে সম্পূর্ণ নতুন আইন প্রণয়নের পূর্বে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য এ আইনের অধীনে থেকেও যে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ নির্বাহী আদেশে করা সম্ভব তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

(দুই)

বিদ্যমান আইনের অধীনে আশু করণীয় বিষয়সমূহ

১. **ধারা-৬ উপজেলা পরিষদের গঠন: ১** (ক) উপধারা ৪ অনুযায়ী, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ও কাউন্সিলরগণের মধ্য থেকে এক তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্যের নির্বাচন আগামী মে ২০১৪-এর মধ্যে সম্পন্নের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. **ধারা ৯ এর বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ:** ২(ক)। শুধুমাত্র চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারমনগণ নয়, সদস্য/সদস্যাগণেরও যথাযথ পন্থায় শপথ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সদস্যগণের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হলে উপজেলা পরিষদের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. **ধারা ১০ এর সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণা: ৩**(ক)। এ ধারা কার্যকর করার লক্ষ্যে নির্বাচনের পর শপথগ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিলের একটি ছক এবং নির্দেশিকা দেয়া যেতে পারে।

৪. **ধারা ২৪ এর পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্দেশ জারি**

৪(ক) ১৭টি ন্যস্ত বিভাগ/দপ্তরের জনবল ও বাজেট উপজেলা পরিষদ তহবিলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে নির্দেশ জারি করা যেতে পারে। বর্তমানে শুধু জনবল ন্যস্ত ধরা হলেও তারা ন্যস্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেন না।

৪(খ) উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল থেকে ন্যস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়ার বিধান করা যেতে পারে।

৪(গ) জাতীয় প্রকল্পের বিভাজ্য অংশ এবং প্রতিটি ন্যস্ত বিভাগের রাজস্ব বরাদ্দের নির্ধারিত বেতন ভাতা ছাড়া বাকী অর্থ উন্নয়ন ও সেবা ব্যয় হিসাবে উপজেলা পরিষদের খাতভিত্তিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪(ঘ) হস্তান্তরিত বিষয়ে কর্মকর্তাদের 'বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন' (Annual Performance Report) উক্ত কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনার অবকাশ রাখে। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের অপর অংশ তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা (তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত) লিখবেন। এ দুই প্রতিবেদনকে একত্রিত করে চূড়ান্ত এসিআর তৃতীয় কোনো উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত হতে পারে। এ বিধানটি ১৯৮৫ পরবর্তী সময়ে উপজেলা পর্যায়ে ন্যস্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল।

৫। **ধারা ২৫ অনুযায়ী উপদেষ্টার ভূমিকা পালনকে কার্যকর করা**

৫(ক) প্রতিমাসের সভার পূর্বে উপদেষ্টা মহোদয়ের কোন পরামর্শ থাকলে তা লিখিত বা মৌখিকভাবে পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানোর জন্য একটি নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। পরিষদ প্রতি সভায় "উপদেষ্টার পরামর্শ" পর্যালোচনার জন্য সভায় একটি 'স্থায়ী এজেন্ডা'র বিধান রাখতে পারে।

৫(খ) পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট পর্যালোচনা সভায় উপদেষ্টার অংশগ্রহণের একটি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে পরিষদের নির্বাহী কার্যক্রমে স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যর সকল রকমের অন্তভূক্তি রহিত করতে হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট সভায় উপদেষ্টাকে প্রধান অতিথি এবং চেয়ারম্যান ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন। এ মর্মে একটি বিধান প্রজ্ঞাপন,বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ সভা উপদেষ্টা কর্তৃক প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারি অর্থ সম্পদ উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়ের সহায়ক হতে পারে। পরিষদ ও জাতীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে সহযোগিতার একটি সেতুবন্ধন রচনায়ও এ সভা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে যে সম্পদ (নগদ অর্থ বা চাল-গম ইত্যাদি) বরাদ্ধ দেয়া হয়, তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে ব্যয় করতে বিধান জারি করতে হবে।

৬। **ধারা ২৯ ও ৪২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্মোক্ত কাজ করা যেতে পারে।**

৬(ক)। ১৭টি (স্থায়ী) কমিটি বিভাগীয় 'ওয়াচ ডগ' হিসাবে গণ্য হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট খাতের তথ্যায়ন, প্রকল্প ও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কমিটিকে মূখ্য ভূমিকায় রাখা যেতে পারে।

৬(খ)। ১৭টি কমিটির বাইরে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তর নির্বাহী আদেশে প্রায় ৭০-৯০টি কমিটি গঠিত হয়েছে। এ সকল কমিটিগুলো বিলুপ্ত করে উপজেলা পর্যায়ের সকল কমিটি কার্যক্রম ১৭টি কমিটির মধ্যে সমন্বয় এবং আত্মীকরণ করতে হবে।

৬ (গ)। প্রতিবছর এপ্রিল-মে মাসে উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে একটি মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা হতে পারে। সে সভায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা এলাকার সকল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর, নাগরিক সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ার, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সবার অংশগ্রহণ থাকতে পারে। ঐ সভায় উপদেষ্টা (একাধিক এমপি ও কোন কোন উপজেলায় থাকতে পারে) প্রধান অতিথি এবং চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন। 'উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় বিষয়টিকে যুক্ত করা যায়।

৭। ধারা ৩৪ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

৭(ক)। অবিলম্বে উপজেলা পরিষদের হিসাবপত্র যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য একজন **সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এবং সহকারী কমিশনারের পদ মর্যাদায় একজন অর্থ ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা নিয়োগ** বা পদায়ন করে পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন প্রয়োজন।

৭(খ)। ইউএনও বা মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরিষদ কার্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করে একজন সাক্ষনিক সচিব নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ইউএনও-এর কার্যক্রম সরকারের রেগুলেটরী (নিয়ামক) কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ রাখা যায়।

৭(গ)। ইউএনও-এর দ্বৈত ভূমিকা সকল সময়েই প্রশাসন, স্থানীয় পরিষদ এবং সরকারের জন্য বিব্রতকর অবস্থা তৈরি করবে। তাই এখানে সরকারের নিয়ামক কার্যক্রম, সংরক্ষিত বিষয় এবং হস্তান্তরিত বিষয়ের একটি কার্যকর পৃথকীকরণ প্রয়োজন।

৮। ধারা ৩৩ এর কার্যক্রম স্পষ্টকরণ

৮(ক)। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরিষদের 'মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা' করা হলে তিনি শুধুমাত্র পরিষদের কর্মেই নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। তার নিয়ামক কার্যক্রম যুগপৎভাবে করার মধ্যে conflict of interest হতে পারে। তাই এ দু' কার্যক্রম ও পদের পৃথকীকরণ প্রয়োজন।

৮(খ)। "সাচিবিক সহায়তা" এবং সচিবের দায়িত্ব স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। 'মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা'র কাজ "সহায়তা"র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তিনি অবশ্যই কিছু কাজের জন্য সরাসরি দায়ী থাকবেন। বর্তমান আইনে নির্বাহী কর্মকর্তার উপজেলা পরিষদে সে রকম দায়বদ্ধতা নেই। তাই তিনি কোন কোন সময় 'নিয়ন্ত্রক' আবার কোনো কোনো সময় নিরব দর্শক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এ ভূমিকার কোনটাই কাম্য নয়। তাই হয়ত একটি পৃথক 'সচিবে'র পদ সৃষ্টি এবং নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরিষদ থেকে প্রত্যাহার অথবা পরিষদের কিছু কাজের জন্য সরাসরি দায়ী করে বিধান জারি করা প্রয়োজন।

৯। ধারা ৫৬ ও ৫৭ কার্যকর করা

৯ (ক) এ ধারা সমূহকে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য একটি বিধিমালা জারি করা যেতে পারে। এ বিধিমালায় পরিষদের ন্যস্ত কর্মকর্তা হিসেবে 'গণ কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আচরনবিধি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্যদের অনিয়ম, ইনসাবঅরডিনেশন ইত্যাদির বিষয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত অপরাধের তালিকা যুক্ত করা যায়।

৯(খ) এইসব অপরাধের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সরাসরি দণ্ড না দিয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর স্ব-স্ব দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করার বিধান থাকতে পারে।

১০। স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং স্থাসবি/উপ-২/সি-৪/২০০৯/১২৫৫, তারিখ-২৮/৪/২০১০ কিঞ্চিত সংশোধন করে নথি চলাচলে ভাইস চেয়ারম্যানদের জন্য কিছু ভূমিকা সৃষ্টি করা গেলে পরিষদ কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বন্দ্ব হ্রাস পেতে পারে।

সম্ভাবনার অপচয় কাম্য নয়

উপজেলা, ইউনিয়ন ও জেলা পর্যায়ে কার্যকর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা তথা সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অপার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের প্রতিটি সরকার-বিরোধী দল নির্বিশেষে দেশের সকল রাজনৈতিক দল এ বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করতে হবে। দল গঠন, দেশ গঠন ও জাতি গঠন পরস্পর বিচ্ছিন্ন কাজ নয়। একই সূত্রে এ তিনটি কাজকে একত্র করে নতুন মালা গাঁথার এখনই সময়। সেই সময়কে অপচয় করার কোনো অবকাশ নেই।

(তিন)

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কারের কতিপয় প্রস্তাব

বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন ও সরকার কাঠামো হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী একটি ধারাক্রম। বৃটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানি আধা উপনিবেশিক শাসনকালে এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার স্বার্থে পুনর্গঠিত করে। স্বাধীন বাংলাদেশেও সামরিক একনায়কতান্ত্রিক শাসনকালে অভিন্ন স্বার্থে সে ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। সে ধারাবাহিকতার জের ধরে বর্তমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন কাঠামো, কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। এ বিকাশমান ধারা একদিকে সামগ্রিকভাবে দক্ষ, কার্যকর, জনঅংশগ্রহণমূলক ও শক্তিশালী একটি সুশাসন ব্যবস্থার যেমন সহায়ক নয়, অপরদিকে দেশের সংবিধান নির্দেশিত সংসদীয় সরকার কাঠামোর সাথেও তা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই বিরাজিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের গঠন পদ্ধতি, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নেতৃত্বের ধরনে যুগোপযোগী পরিবর্তন প্রয়োজন। সে পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সুপারিশ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলো।

পরিবর্তনের প্রথম ও প্রধান সোপান–

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামোর আদল থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় রুপান্তর: বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় শাসন কাঠামো সংসদীয় পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্থানীয় সরকার কাঠামো পুরোপুরি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির আদলে চলছে। গত চল্লিশ বছরে এ ব্যবস্থা নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা ও লেখালেখি হলেও এ ব্যবস্থাটি সংশোধনের উদ্যোগগুলো বরবার হোঁচট খেয়েছে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে স্থানীয়

সরকার ব্যবস্থায় এক ব্যক্তির একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলাপরিষদের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ক্ষমতাধর চেয়ারম্যান এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে একই রকমের মেয়র পদ্ধতি চালু আছে। জেনারেল আইয়ুবের প্রবর্তিত "মৌলিক গণতন্ত্র" ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারে রাষ্ট্রপতিকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে যে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন কাঠামোর সৃষ্টি, পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশেও দীর্ঘদিনের পরপর দু'টি সামরিক শাসনাধীনে সে প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার যে সব আইনকানুন বিধিবিধানগুলো করা হয় তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির অধস্তন প্রতিষ্ঠান হিসাবেই চেয়ারম্যান ও মেয়রদের 'মিনি রাষ্ট্রপতির' আদলে গড়ে তোলা হয়। সংসদীয় পদ্ধতির জাতীয় সরকার ও শাসন কাঠামো প্রবর্তনের পরও স্থানীয় পর্যায়ে পুরানো আদলই বহাল থাকে যা স্থানীয় সুশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রত্যাশিত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পুরোপুরি সক্ষম হচ্ছে না।

এ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ: বর্তমান পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সদস্য ও কাউন্সিলরদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট নয়। একক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে যৌথ দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা ক্ষতিগ্রস্ত। নেতৃত্বের সুষ্ঠু বিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আর্থিক, বিচারিক সকল ক্ষমতা এককভাবে এক ব্যক্তি তথা চেয়ারম্যান বা মেয়রের অধীন। এতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাধাগ্রস্ত এবং নেতৃত্বের বিকাশ যথাযথভাবে হচ্ছে না। দুর্নীতি ও অব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে এবং অনিবার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে অভ্যন্তরীন হতাশা, কোন্দল ও সংঘাত। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ও বর্তমান কাঠামোয় একরকম অন্তরীণ ও অবরুদ্ধ। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রতিজন নাগরিক তিনটি করে ভোট দিলেও শুধুমাত্র চেয়ারম্যান বা মেয়রের ভোটটি কার্যকর থাকে। অপর দু'টি ভোট যা সাধারন আসনের সদস্য বা কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সদস্যগণকে দেয়া হয়, কাঠামোগত ত্রুটির কারণেই তাঁরা মোটামুটি অকার্যকরই হয়েই থাকেন। বর্তমান ব্যবস্থায় পরিষদ বা কাউন্সিল সম্মিলিতভাবে চেয়ারম্যান বা মেয়রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত বা সংসদীয় ধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। চেয়ারম্যান বা মেয়রগণের স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে সদস্য ও কাউন্সিলার পদসমূহ তুলনামূলকভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতাহীন হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় এসব পদে এখন আর যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। চেয়ারম্যান এবং মেয়র পদে গড়ে আট/দশজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ঐ একটি পদই এখন স্থানীয় কাউন্সিলসমূহের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে পড়েছে। ফলে বর্তমান ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনগুলো মূলতঃ চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচন হিসাবে সাধারণভাবে গণ্য করা হয়। সদস্য এবং কাউন্সিলরগণ নির্বাচন পরবর্তী বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নিস্প্রভ ও নিষ্ক্রিয় থাকেন।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা: পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে 'মিনি সংসদীয়' পদ্ধতি কার্যকর হতে দেখা যায়। বৃটেন ও ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরাসরি চেয়ারম্যান/ প্রধান/মেয়র নির্বাচন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করা হয় না। স্থানীয়ভাবে নাগরিকগণ একটি মাত্র ভোট প্রয়োগ করে একজন কাউন্সিলর বা সদস্য নির্বাচন করেন। পরিষদ বা কাউন্সিল নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দল বা গোষ্ঠি কাউন্সিলে নির্বাহী দাযিত্ব গ্রহণ করে থাকে। প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ার/প্রধান/মেয়র এর নেতৃত্বে একটি ছোট নির্বাহী কাউন্সিল গঠিত হয়। বাকি সদস্য/কাউন্সিলরগণ নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন না। তারা সাধারণ সভায় প্রতিটি সিদ্ধান্তের ওপর আলোচনা ও ভোটাভুটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখেন। তা'ছাড়া স্থায়ী কমিটিসমূহের মাধ্যমে নির্বাহী কাউন্সিলকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে থাকে। প্রতিটি স্থানীয় কাউন্সিল বা পরিষদে ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য আইন ও নির্বাহী দায়িত্বের একটি বিভাজন থাকে। প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়সহ প্রায় ২০টি রাজ্যে এ নীতি অনুসৃত। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোটে কোন সভাপতি/প্রধান/উপ-প্রধান বা মেয়র নির্বাচিত হন না। নির্বাচিত কাউন্সিল বা পরিষদ পরোক্ষ ভোটে প্রধান/সভাপতি/মেয়র প্রমুখ নির্বাচন করেন। বলাবাহুল্য, সেখানে সর্বত্র স্থানীয় নির্বাচন দলভিত্তিকই হয়। দলসমূহ এসব স্থানীয় নেতৃত্বের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক দলের স্থানীয় সরকার বিষয়ক পৃথক জাতীয় ও আঞ্চলিক ফোরাম রয়েছে।

মেয়র বা পঞ্চায়েত প্রধানগণ হাউজের সংখ্যাগরিষ্টের আস্থাভাজন থাকলে স্বপদে বহাল থাকেন। আস্থা হারালে আবার সদস্য বা কাউন্সিলরের আসনে বসেন। এ ব্যবস্থায় আমাদের মত মেয়র এবং সাধারণ কাউন্সিলরদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা দক্ষতায় আকাশ পাতাল পার্থক্য হয় না। মেয়র বা প্রধান হতে ইচ্ছুক সবাই মূলত: সদস্য বা কাউন্সিলর। সবাই সদস্য বা কাউন্সিলর পদেই নির্বাচনে প্রার্থী হন। ফলে সাধারণভাবে কাউন্সিলের অভ্যন্তরে সমতার সাধারণ নীতি প্রাধান্য পায় এবং আলাপ আলোচনার গুণগত মান উন্নত হয়। আমাদের দেশে মেয়র ও চেয়ারম্যান এবং বিপরীত দিকে সদস্য ও কাউন্সিলরগণ পৃথক দু'টি শ্রেণিতে বা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের নারীদের বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনার দাবিদার। কারণ তারা আরও ভিন্ন রকমভাবে প্রশাসনিক অধস্তনতার শিকার হয়ে পড়েন।

নারীর ক্ষমতায়ন অবরুদ্ধ: যে কোন দেশ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন সে দেশ বা রাষ্ট্রের সংবিধান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান সুস্পষ্ট ভাষায় নারী পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, জন্মস্থান, নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান: মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮(১),(২),(৩),(৪) এবং ২৯ (১)(২)। তা'ছাড়া শুধুমাত্র কেনোরুপ বৈষম্য না করে সমান অধিকার প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। "অনগ্রসর" ও "পশ্চাদপদ" অংশকে সমাজ উন্নয়নের মূলস্রোতে শামিল করার জন্য "বিশেষ বিধান" প্রণয়নেও রাষ্ট্রকে উৎসাহিত করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৮(৪)। সংবিধানের এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। স্থানীয় সরকার বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রথম সোপান। তা'ছাড়া স্থানীয় সরকার গণতান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সঠিক ভূমিকা পালনের একটি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও বটে। তাই রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে দেশের ৫০% জনশক্তি ও নাগরিকের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর সম্পৃক্ততা এদেশে একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় হওয়া বাঞ্চনীয় এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজন বাস্তবমুখী রাজনৈতিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। আমাদের সংবিধান এ বিষয়ে অত্যন্ত

উদার। অতীতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সে পরীক্ষা-নীরিক্ষায় উচ্চতর নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে তেমন আন্তরিকতার প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে যেসব নারী অনেক উৎসাহভরে এগিয়ে এসেছিলেন তারা ক্ষমতায়িত হবার বদলে কোন কোন ক্ষেত্রে নিগৃহীত ও অসম্মানিত হয়েছেন। তাই বিগত এক দশকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সে পরিস্থিতির অবসান করা জন্য নতুন কর্মকৌশল প্রণয়ন করা দরকার।

নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি সর্বত্র গুরুত্বের সাথে আলোচনা হলেও সাধারণ নাগরিকদের স্থানীয় সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রায়শ আড়ালে থেকে যাচ্ছে। তা'ছাড়া স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের অভ্যন্তরে ক্ষমতা কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃত চর্চা সাধারণভাবে দেখা হচ্ছে না। তা'ছাড়া বর্তমান সময়ে স্থানীয় সরকারকে একটি আদর্শ ব্যবস্থা বিবেচনা করেই সকল আলোচনা আবর্তিত। দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, পেশিশক্তির দাপট ও দুর্নীতির এবং অনিয়মের একটি দুষ্টচক্র স্থানীয় সরকার নেতৃত্ব কাঠামোকেও গ্রাস করেছে সে বিষয়সমূহ স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে নিবেদিত অনেক সিভিল সোসাইটি কার্যক্রম ও এনজিও তাড়িত এ্যাডভোকেসি কর্মসূচিসমূহে সঠিকভাবে প্রতিফলন হয় না। তাই ভবিষ্যতের যে কোন সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাবে জাতীয় রাজনীতির যেসব নেতিবাচক প্রভাব স্থানীয় রাজনীতি ও নেতৃত্ব কাঠামোয় স্থায়ীরূপ লাভ করেছে তা পরিবর্তনের লক্ষ্যেও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিতে হবে। স্থানীয় পরিষদ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবহিদিতা, সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

অতীতের সীমাবদ্ধতা: পূর্বেই বলা হয়েছে উচ্চতর নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে আন্তরিকতার অভাব ছিল না, অভাব ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক মাঠ পর্যায়ের সঠিক অবস্থা নিরূপণের। **প্রথমত:** তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনা করেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারকে রূপ ও কাঠামো দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র নারীদের দাবি পূরণের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে পুরুষদের মূল অবস্থান অক্ষত রেখেই নারীর জন্য অতিরিক্ত বা প্রান্তিক পর্যায়ের এক তৃতীয়াংশ পদ বা প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি করা হয়েছে। যে প্রকোষ্ঠে তাদেরকে পৃথক নির্বাচনের লোক দেখানো একটি বৈধতা দিয়ে বন্দি করে রাখা যায়। **দ্বিতীয়ত:** পরিষদ কাঠামোটি যেখানে পুরোমাত্রায় স্বৈরতান্ত্রিক ও এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন, সেখানে প্রান্তিক অবস্থান থেকে আসা এবং পরিষদ কাঠামোতেও নতুনভাবে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়া নারীর পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। ফলে তারা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ঘুরে পড়ে গেছেন বার বার। **তৃতীয়ত:** নারীর জন্য এক তৃতীয়াংশ আসনের নির্বাচন ব্যবস্থা তা কোন মূল আসন ছেড়ে দিয়ে নয়, তা হচ্ছে মূল আসনের অতিরিক্ত বা বাড়তি। তাই এ অতিরিক্ত, বাড়তি বা উচ্ছিষ্ট জাতীয় অবস্থান থেকে ভাল কিছু অর্জন করা সম্ভব ছিল না। **চতুর্থত:** পরবর্তীতে স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতির পদ সৃষ্টি এবং কমিটির সংখ্যাবৃদ্ধি করে সান্তনা পুরস্কারের যে প্রচেষ্টা তা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা হয়ে দেখা দেয়। কারণ একাজে কোন আর্থিক বরাদ্দের বালাই ছিল না। বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নেতৃত্ব কাঠামোতে শুধুমাত্র নারীগণ উপেক্ষিত তা নয়, পরিষদের সাধারণ আসনের পুরুষ সদস্যগণেরও আইনগত কোন স্বচ্ছ ও শক্ত অবস্থান নেই। সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা এক্ষেত্রে উন্নত হবে সেটি স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় না। এসব বিষয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৃহত্তর নীতিগত দিকে প্রথমে সংশ্লিষ্ট সবার ঐকমত্য দরকার। তাহলে হয়ত সমস্যার মূলে গিয়ে তার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের একটি টেকসই পথ বের হয়ে আসতে পারে।

১) মূলধারার সাংগাঠনিক কাঠামোতে একটি মাত্র পদ বা পদবীর একক নেতৃত্বের যে একটি চক্র বা বৃত্ত বর্তমানে পাকাপোক্ত আছে, তা সংশোধন করে এখানে যৌথ এবং গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব কাঠামো সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিতে হবে।

২) স্থানীয় সরকার তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থানের বিশেষ ব্যবস্থার পরিবর্তে নারী নেতৃত্বকে মূলধারায় সম্পৃক্তির উপায় খুঁজতে হবে। শুধুমাত্র যৌথ নেতৃত্ব কাঠামোতেই এ সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব।

৩) এ যৌথ ও দায়বদ্ধ নেতৃত্ব কাঠামোর সাংগঠনিক রূপ হতে পারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদীয় পদ্ধতির প্রয়োগ।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন সংসদীয় পদ্ধতির কাঠামো

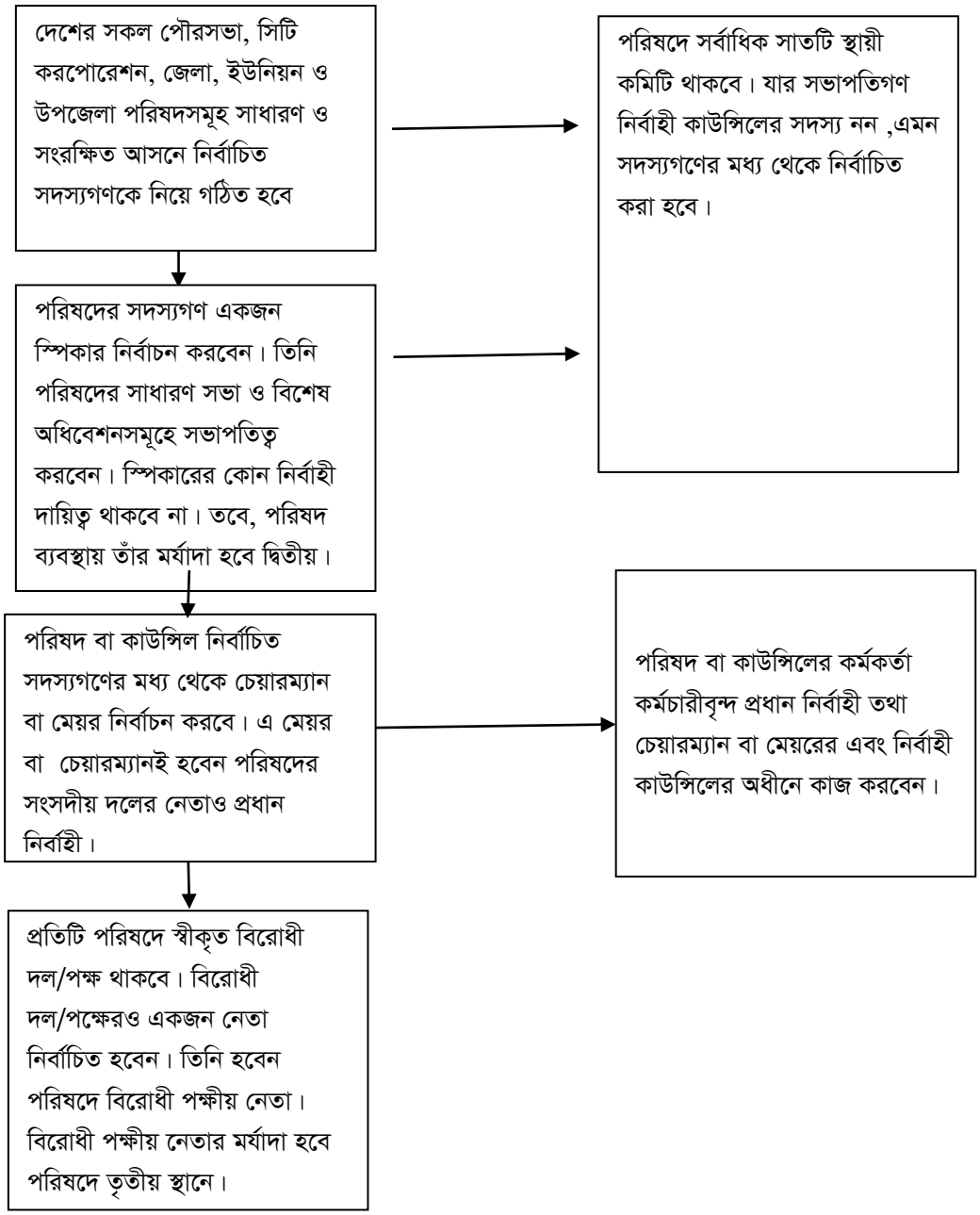

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কাঠামো

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কাঠামোর অধীনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের (ইউপি, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচনে প্রতিটি নাগরিক তিনটি পদের জন্য তিনটি পৃথক ভোট প্রদান করে থাকেন। তিন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত জন/প্রতিনিধির ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যবহার এবং প্রয়োগে বৈষম্য এবং মাত্রাগত ও প্রকারগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত ছকে নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি দেখা যেতে পারে।

প্রচলিত নির্বাচন কাঠামো

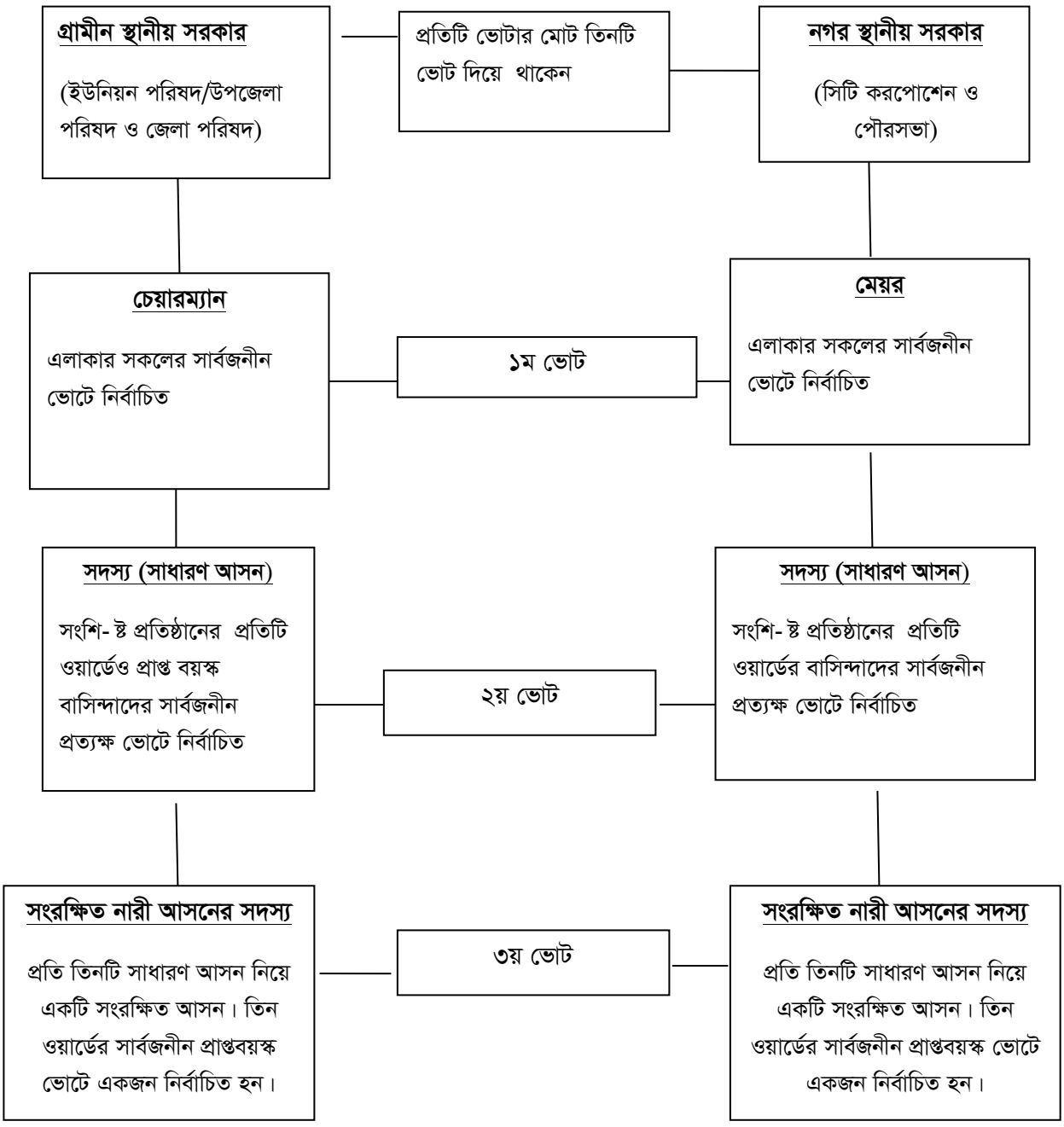

এখানে চেয়ারম্যান বা মেয়র যখন সমগ্র এলাকার সকলের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন স্বাভাবিকভাবে চেয়ারম্যান বা মেয়র সদস্য বা কাউন্সিলরদের নিকট দায়বদ্ধতা অনুভব করেন না। সাধারণ আসনের সদস্যগণ একটি সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ডেও প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তারা তার ওয়ার্ডের ভোটারদের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। মহিলা সদস্য/কাউন্সিলরগণের নির্বাচনী এলাকা তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত। কিন্তু ঐ তিনটি ওয়ার্ডের তিনজন সাধারণ সদস্য থাকায় নারী সদস্যারা কোথাও স্থান পান না। অপরদিকে চেয়ারম্যান সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসন দুই আসনের সদস্যদের তোয়াক্কা না করে সরাসরি ম্যান্ডেট প্রাপ্ত হিসাবে পুরো এলাকা জুড়ে একক কর্তৃত্ব করেন। এ ত্রিমুখী শাসনের অবসান করে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে জনগণ মাত্র একটি ভোট প্রদান করবে। মহিলা সদস্যগণও একটি সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। চেয়ারম্যান বা মেয়রগণ মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবেন। এক ব্যক্তির একক শাসন ব্যবস্থার স্থলে যৌথ নেতৃত্ব বিকশিত হবে। পরিষদ বা কাউন্সিলের অভ্যন্তরে সুস্থ নীতি বিতর্ক ও আলাপ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ক্ষমতাভিত্তিক একটি অবস্থান থেকে সদস্য ও চেয়ারম্যান কাজ করতে পারবেন।

একজন চেয়ারম্যান বা মেয়রের একক ও সরাসরি নির্বাচন না করে এবং একটি একক এলাকার তিনটি পৃথক ক্ষমতা কেন্দ্র সৃষ্টি না করে একটি কেন্দ্রে জনজবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা যায় যা সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে খুব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করা সম্ভব।

কীভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় রীতিনীতি চালু করা যায়: স্থানীয় সরকারের পাঁচটি ইউনিট (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন) এর প্রত্যেকটিকে জনসংখ্যা ও এলাকার প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হতে পারে। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত আছে। উপজেলায় কোন ওয়ার্ড নেই। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। তা'ছাড়া চেয়ারম্যান, সাধারণ আসনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত নারী আসনের ভাইস চেয়ারম্যান তিনজনের নির্বাচনী এলাকার আয়তন ও ভোটার সংখ্যা একই থাকে। জেলা পরিষদ ১৫টি সাধারণ সদস্যের এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন নারী সদস্য (জেলা পরিষদ আইন ২০০০) এবং চেয়ারম্যান এর সরাসরি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। তবে এসব সদস্যও চেয়ারম্যান সর্বজনীন নয়, আইন বলে গঠিত একটি নির্বাচক মন্ডলীর ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড সংখ্যার ভিন্নতা রয়েছে। সকল ভিন্নতাকে একটি সাধারণ নীতির মাধ্যমে অভিন্ন কাঠামোতে নিয়ে আসা যায়। তার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সন্নিবেশ করে একটি **সাধারণ আইন (mother law)** করা যেতে পারে।

(১) স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সংখ্যা একটি সাধারণ ফর্মুলার ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। ফলে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা , পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে জনসংখ্যা অনুসারে ওয়ার্ড সংখ্যার ভিন্নতা থাকবে। উদাহরণ হিসাবে ধরে নেয়া যাক প্রতিটি ইউনিয়নে ১ হাজার ভোটার পিঁছু একটি ওয়ার্ড গঠিত হতে পারবে। এভাবে একটি ইউনিয়নে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থেকে ২০ এ সীমাবদ্ধ হতে পারে। উপজেলা ও জেলার জন্য ভিন্ন ফর্মুলা হতে পারে। একটি ইউনিয়নকে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে তিনটি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা যায়। এভাবে উপজেলার অন্তর্গত প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে তিনজন সদস্য উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত হবেন। ধরা যাক একটি উপজেলায় সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ২০টি ইউনিয়ন থাকলে সেখানে সদস্য হবে যথাক্রমে ১৫ এবং ৬০ জন। একইভাবে প্রতিটি উপজেলা থেকে তিনজন সদস্য জেলা পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে একটি জেলায় ৪ থেকে ২০টি উপজেলা থাকলে সেখানে একটি জেলা পরিষদে ১২ থেকে ৬০ জন সদস্য আসতে পারেন। একই রকমভাবে পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনেরও মোট ওয়ার্ড ও কাউন্সিলারের আসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে তাতে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মোট সংখ্যা ভিন্ন হলেও পদ্ধতি অভিন্ন হবে। নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ তাদের মধ্য হতে মেয়র নির্বাচন করবেন।

২। নির্বাচিত ওয়ার্ডে সদস্যদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচিত হবেন। যারাই চেয়ারম্যান বা মেয়র হতে ইচ্ছুক তাদেরকে প্রথমে অবশ্যই যে কোন একটি ওয়ার্ড থেকে সদস্য বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে।

৩। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা এককে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং কোন পরিষদ বা কাউন্সিলরের মোট আসনের সংখ্যা নির্ধারিত হলে সংরক্ষিত আসন প্রতি নির্বাচনে ঘুর্ণায়মান পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে। এভাবে প্রতিটি নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ড বা আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে তবে এলাকা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। একজন নারী একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রতি দুই নির্বাচনের পর একবার সুযোগ পাবেন। মধ্যবর্তী দু'টি নির্বাচনে তাকে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের মাত্রা ও গতিপ্রকৃতি উপলব্ধির সুযোগ হবে।

নারীর আসন বন্টন চিত্র (ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ড ধরে)

প্রথম নির্বাচন (২০১৬)

সংরক্ষিত	সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ	সাধারণ	সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ	সাধারণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

দ্বিতীয় নির্বাচন (২০২১)

সাধারণ	সাধারণ	সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ	সাধারণ	সংরক্ষিত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

তৃতীয় নির্বাচন (২০২৬)

সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ	সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ	সাধারণ	সংরক্ষিত	সাধারণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

এভাবে যে কোন পরিষদের আসন সংখ্যাকে তিন দিয়ে ভাগ করে প্রতি নির্বাচনে ঘুর্নায়মান পদ্ধতিতে নারী আসন সংরক্ষণ করা যাবে। তাতে সংরক্ষিত নারী সদস্যগণ সুনির্দিষ্ট একটি আসনের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করবেন। তা'ছাড়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে তারা অবাধে চেয়ারম্যান/মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

কোন নির্বাহী প্রধান বা কাউন্সিল সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা হারালে তারা বিরোধী আসনে বসবেন। নির্বাহী প্রধান, নির্বাহী পরিষদ, স্থায়ী কমিটি এবং সাধারণ পরিষদ প্রতিটি পদ ও ফোরামের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা থাকবে। তোমনভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধীদল বা বিরোধী পক্ষীয় প্রধানও নির্বাচিত হবেন। কারণ Leader of the oppsition এর কিছু স্বীকৃত ভূমিকা থাকবে।

সংসদীয় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ঃ

কোন পদ্ধতিই সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধমুক্ত নয়। তবে প্রস্তাবিত সংসদীয় পদ্ধতি বিরাজমান এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক পদ্ধতির তুলনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।

সুবিধাসমূহঃ (১) প্রধান নির্বাহী বা প্রতিটি পরিষদ বা কাউন্সিলের প্রধান ব্যক্তিকে অনেক বেশি জবাবদিহি করতে হবে এবং স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ কমে যাবে। একই রকমভাবে বিরোধী পক্ষীয় নেতাকেও আনুষাঙ্গিক ভূমিকার কারণে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। (২) চেয়ারম্যান বা মেয়রের পদ অত্যধিক আকর্ষণীয় হওয়ায় সকল যোগ্যপ্রার্থীগণ শুধুমাত্র প্রধান পদটির জন্য নির্বাচন করেন। তাতে পুরো নির্বচনী কর্মকাণ্ড চেয়ারম্যান বা মেয়রকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সদস্য বা কাউন্সিলর পদসমুহ গুরুত্বহীন চিহ্নিত হওয়ায় ঐসব পদে যোগ্য প্রার্থী থাকে না। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সদস্য ও কাউন্সিলরগণ প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন। (৩) চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচন অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান বা মেয়রের পক্ষেও এককভাবে সকল নির্বাচকমণ্ডলীর সাথে যোগাযোগ রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নির্বাচন সহজ হবে। নির্বাচন সাধারণভাবে কম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজ হবে। (৪) কাউন্সিল বা পরিষদগুলোর নেতৃত্বে এক ধরনের মেধা, মনন, যোগ্যতা ও দক্ষতা সংকট কিছুটা কমবে। চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের দুরত্ব কমে যাবে। ফলে পারস্পরিক সমতার ভিত্তিতে গঠিত পরিষদের আলাপ আলোচনার পরিবেশে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। (৫) বর্তমান পরিষদ বা কাউন্সিলে প্রাণবন্ত কোন আলোচনা হয় না। স্থায়ী কমিটিগুলো অকার্যকর থাকে। মেয়র/চেয়ারম্যান এককভাবে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। পৌরসভা বা অন্যান্য পরিষদগুলো পরিচালিত হয় মেয়র বা চেয়ারম্যানের একক নেতৃত্বে। নতুন ব্যবস্থায় পরিষদ প্রাণবন্ত হবে বিরোধী পক্ষীয় নেতা এবং স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ সক্রিয় হবার প্রণোদনা পাবেন। (৬) মেয়র ও চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসাবে স্ব স্ব কাউন্সিল বা পরিষদে দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে পরিষদের নির্বাহী কর্মে অধিকতর গতি সঞ্চার হবে। পূর্বে চেয়ারম্যান বা মেয়র ব্যতিত অন্য কারও কোন নির্বাহী দায়িত্ব থাকত না। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নির্বাহী দায়িত্ব পালনে যৌথ নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে।

অসুবিধাসমূহ

সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা অনেকে বলে থাকেন সীমাবদ্ধতার সাথে আরও কিছু সম্ভাবনা নিম্নরূপ হতে পারে। (১) পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অনেকে মৌলিক গণতন্ত্রের মন্দ দৃষ্টান্ত হিসেবে অজানা শঙ্কা নিয়ে দেখে থাকেন। "মৌলিক গণতন্ত্র" ব্যবস্থার চেয়ে প্রস্তাবিত পরোক্ষ নির্বাচন মৌলিকভাবে ভিন্ন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে সদস্য বা কাউন্সিলরগণ ছিলেন ইলেক্ট্রোরাল কলেজের সদস্য। সে হিসাবে তারা দেশের সাধারণ জনগণকে ভোটবিহীন করে তারাই থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, প্রাদেশিক পরিষদ, জাতীয় পরিষদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতেন। ঐ অতি রাজনীতিকতার কারণেই ঐ ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। বর্তমান প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এ ধরণের সুযোগ নেই। (২) অনেকে মনে করেন যে, চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচন পরোক্ষ পদ্ধতিতে হলে ব্যাপকভাবে ভোট বিক্রি হবে/হতে পারে। তবে তা স্থায়ী হবে না। মূলতঃ দু'টি কারণে (ক) দলভিত্তিক নির্বাচন হলে দলীয়ভাবে সকল পরিষদে সরকার বা নির্বাহী কাউন্সিল গঠিত হবে। (খ) এখানে দলগতভাবে বিরোধী দলের স্বীকৃতি থাকবে। দলগত স্বীকৃতির কারণে ভোট বিক্রি সম্ভব হবে না।(গ) কোন দলের একক সংখ্যাগরিষ্টতা না থাকলে মোর্চা করে 'সরকার' গঠনের অবকাশ থাকবে। (ঘ) স্বতন্ত্র বা নির্দল প্রার্থীর নির্বাচন করারও পূর্ণ স্বীকৃতি থাকবে। (৩) কেউ কেউ মনে করেন পরিষদে ঘণঘণ অনাস্থার পরিবেশ এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হলে 'নির্বাহী কাউন্সিল' পরিবর্তন হবে। কিন্তু পরিষদের আসন শূণ্য হবে না। কেউ আসন শূণ্য করে চলে গেলে উপনির্বাচন হবে। আস্থা-অনাস্থার ভিত্তিতে নির্বাহী পরিবর্তন হলে তা পূরণ হতে একটি অতিরিক্ত অধিবেশনই শুধু প্রয়োজন হবে। বর্তমান সময়ে সাসপেন্ড ও বরখাস্ত করার পর বছরের পর নির্বাচন ঝুলে থাকার যে অচলাবস্থা তা নিরসন হবে। (৪) কাউন্সিল বা পরিষদ ব্যবস্থাধীনে নির্বাচন করা হলে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে জাতীয় সংসদ সদস্যের সাথে স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতের নিরসন হবে। কারণ জাতীয় সংসদ সদস্য সদস্যের নির্বাচনী এলাকার সাথে উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ বা পৌর বা সিটি করপোরেশন চেয়ারম্যান বা মেয়রের নির্বাচনী এলাকা কখনও সমান বা কাছাকাছি হবে না। নির্বাচনী এলাকাগত দিক থেকে জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকা হতে বৃহত্তর, তাতে সংসদ সদস্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। (৫) বর্তমান সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের যেসব সমিতি, সংঘ ও ফোরাম দেখা যায় সেগুলো শুধুমাত্র চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ দ্বারা চালিত। ফলে সামগ্রিকভাবে সদস্য ও কাউন্সিলরগণ উপেক্ষিত থাকেন। সরাসরি মেয়র এবং চেয়ারম্যান নির্বাচন রহিত হলে কাউন্সিলর ও সদস্যগণই মূলতঃ একটি সংগঠিত শক্তি হিসাবে আবির্ভুত হবেন। নেতৃত্বের গুণগত মান উন্নত হবে। (৬) বর্তমান ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান বা মেয়রের সরাসরি নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্য হতে নির্বাচনের পর সকল পরাজিত প্রার্থীগণ হারিয়ে যান। তাদের সেবা থেকে কাউন্সিল বা পরিষদ পুরোপুরি বঞ্চিত হয়। তাদের পরিষদের অভ্যন্তরে অবদান রাখার আর কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যারাই চেয়ারম্যান বা মেয়র হতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই প্রথমে সদস্য হবেন বিধায় চেয়ারম্যান বা মেয়র না হতে পারলেও তারা পরিষদেই অবস্থান করবেন এবং পরিষদে অবদান রাখার সুযোগ পাবেন। (৭) প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দেশে অধিকতর দায়িত্বশীল স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এ নেতৃত্ব ধাপে ধাপে উচ্চতর পর্যায়েও অবদান রাখতে পারবে। স্থানীয় ভিত্তি ও স্থানীয়ভাবে সম্পর্কহীন লোকের পক্ষে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ কমে যাবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত নেতৃত্বের একটি নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় সে ধারা থেকে বের হবার একটি প্রক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। (৮) প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ব্যয় হ্রাস পাবে এবং নতুন নতুন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা গঠন বন্ধ হবে। জনসংখ্যা বেশি হলে সদস্য বা ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়বে। নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না। বরঞ্চ ভবিষ্যতে ছোট ছোট পরিষদ একীভূত করা সম্ভব হবে।

নতুন ব্যবস্থায় নির্বাহী দায়িত্বঃ নতুন ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান বা মেয়রের নির্বাহী কার্যক্রম বা দায়িত্ব কোনক্রমেই ক্ষতিগস্ত হবে না। বরঞ্চ চেয়ারম্যানের হাত অধিক শক্তিশালী হবে। পূর্বে চেয়ারম্যান বা মেয়র যা এককভাবে করতেন, নতুন পদ্ধতিতে কতিপয় সদস্য বা কাউন্সিলরের মধ্যে দায়িত্ব বা দপ্তর বন্টন করে দিয়ে কাজে অধিকতর গতি সঞ্চার করতে পারবেন। নির্বাহী কাউন্সিলে নতুন ব্যবস্থায়ও চেয়ারম্যানকে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রতিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয় বা দপ্তরের বিপরীতে স্থায়ী কমিটি প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কাউন্সিল সদস্যকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখবেন। অপরদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত বিরোধী নেতা পূর্ণাঙ্গ পরিষদ সভায় চেয়ারম্যান (Leader of the House) কে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে ভূমিকা পালন করতে পারবেন। পরিষদের অভ্যন্তরে একটি বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান (ইউপি, উপজেলা, জেলা পৌরসভা ও করপোরেশন) এ নিয়োগপ্রাপ্ত ও প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী পরিষদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করবেন।

বর্তমান ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি (চেয়ারম্যান, সদস্য, মেয়র বা কাউন্সিল) গণের নির্বাহী দায়িত্বের সাথে তাদের পরিষদ কার্যে কে কতটুকু সময় দেবেন এবং দাপ্তরিক দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। নতুন বা প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান ((Leader of the House) এবং নির্বাহী কাউন্সিলের (মিনি মন্ত্রী পরিষদ) সদস্যগণ সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন। তারা সে হিসাবে ভাতা বা সম্মানী গ্রহণ করবেন। বিরোধী নেতারও সম্মানি নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের চেয়ে কম হবে না। বাকি সদস্যগণ খণ্ডকালীন এবং হয়ত সভায় যোগদান ও বিশেষ দায়িত্বের জন্য ভাতা গ্রহণ করবেন। তারা প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত ভাতা নাও পেতে পারেন।

চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচন পদ্ধতি এবং নির্বাহী প্রধান ও কাউন্সিলের কর্মপদ্ধতি

প্রতিটি স্থানীয় সরকার এককের সকল ওয়ার্ড সদস্য বা কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে তাদেরই গোপন ব্যালেটে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যান বা মেয়র পরিষদের আস্থাভাজন থাকলে পরিষদের মেয়াদের পুরো সময় দায়িত্ব পালন করবেন। মধ্যবর্তী যে কোন সময়ে নিয়ম মোতাবেক অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে সদস্যের সারিতে বসবেন এবং নতুন মেয়র বা চেয়ারম্যান তার নির্বাচনী পরিষদ গঠন করবেন।

- চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচনের পর গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে পাঁচ সদস্যের একটি নির্বাহী কাউন্সিল গঠন করতে পারে এবং নির্বাহী পরিষদ পরিষদের সার্বক্ষনিক নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাহী কাউন্সিলের প্রধান থাকবেন। সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এবং ৫০ এর অধিক ওয়ার্ড বিশিষ্ট যে কোন পরিষদের ক্ষেত্রে নির্বাহী কাউন্সিল ১০ সদস্যের হতে পারে।
- নির্বাহী কাউন্সিল এর সদস্যেগণের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট বিষয় বা দপ্তর থাকবে। সদস্যগণ এক বা একাধিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ দিবেন, তাঁর নিজেরও এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট বিষয় বা দপ্তর থাকবে,
- পরিষদ বা কাউন্সিলের বাকি সদস্যগণ পরিষদের সভায় প্রতিটি সিদ্ধান্তের ওপর ভোটের অধিকারী হবেন। তারা মূলতঃ আইন পরিষদ সদস্যের মত দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রতিটি নির্বাহী কাউন্সিল সদস্যের বিষয়ের বা দপ্তরের বিপরীতে স্থায়ী কমিটির বিধান থাকবে। আবার এ বিষয় ছাড়াও অর্থ, হিসাব ও বাজেট এবং কিছু সাধারণ বিষয়ে স্থায়ী কমিটির বিধান থাকবে। নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য নন, এমন সদস্যগণই এসব কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য হবেন।
- নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির কাছে তাদের কাজের জবাবদিহি করবেন এবং নির্দেশনা ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।
- প্রতিটি পরিষদ বা কাউন্সিল তাদের সাধারণ সভা বা অধিবেশন পরিচালনার জন্য জাতীয় সংসদের "স্পিকারের" মত একটি পদ সৃষ্টি করতে পারেন। একজন সদস্য বা কাউন্সিলার যে কোন পরিষদ (ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা) এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তার কোন নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে না। তিনি সাধারণ সভা এবং বিশেষ অধিবেশন যথা বাজেট অধিবেশন, পরিকল্পনা পাশের অধিবেশন ইত্যাদিতে সভাপতিত্ব করবেন। যেখানে হাউজের নেতা (চেয়ারম্যান), বিরোধী নেতা ও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য সাধারণ সদস্যের সারিতে আসন গ্রহণ করবেন।
- চেয়ারম্যান এবং মেয়রগণ "নির্বাহী কাউন্সিল" এবং বিশেষ কোন কমিটি থাকলে সেখানে সভাপতিত্ব করবেন, কিন্তু পরিষদের সাধারণ সভা স্পিকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রতি তিন মাসে তিন দিনের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠান হবে বাধ্যতামূলক। তা'ছাড়া বাজেট, পরিকল্পনা ও ওয়ার্ডসভার প্রস্তাব, স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা পূর্বক নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য যে কোন একটি পরিষদ বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে নূন্যপক্ষে ৫০ দিন অধিবেশন করতে হবে। কোন অধিবেশন একনাগাড়ে তিনদিনের কম হবে না।
- চেয়ারম্যান, মেয়র, নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, স্থায়ী কমিটি ওয়ার্ডসভা, সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ডাকা, স্থগিত, সাধারণ পরিষদ যেভাবে স্পিকারের দায়িত্ব ও দক্ষতা, প্রস্তাব আনায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা ও নিয়মকানুন তৈরি করতে হবে।

নতুন পদ্ধতি চালুর প্রক্রিয়া

মতবিনিময়ঃ

প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আদল পরিবর্তন করে 'সংসদীয় পদ্ধতি'র আদল চালুর বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে মত বিনিময় হতে পারে। এসব মতবিনিময় সভাসমূহে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তৃণমূল নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ ইউপি সদস্য (মহিলা ও পুরুষ), পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকদের মতামত নেয়া জরুরি। বর্তমান সময়ের স্থানীর সরকার বিষয়ক মতবিনিময় কার্যক্রমে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান ও মেয়রদেরই প্রাধান্য দেয়া হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। অবশ্যই মেয়র এবং চেয়ারম্যানদের মতামতও নিতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ** নারীদের বিশেষ বা পৃথকভাবেও মতামত নেয়া প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধিগণের মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্য বিশেষতঃ স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাথে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন। **তৃতীয়তঃ** বৃহত্তর আঙ্গিকে বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সাথে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় প্রয়োজন।

আইনগত প্রক্রিয়াঃ সবার মতামত বিবেচনা করে নেতৃত্ব কাঠামো, আসন ও ওয়ার্ড (দলীয়/নির্দলীয়) সাধারণ পরিষদ বা কাউন্সিলের গঠন ও কার্যক্রম, নির্বাহী প্রধান ও নির্বাহী পরিষদ, পরিষদে বিরোধী নেতার অবস্থান ও ভূমিকা, স্থায়ী কমিটি, আস্থা-অনাস্থার বিষয়গুলোকে একটি সাধারণ আইনের আওতায় আনা যায়। এ আইনটি দেশের বিরাজিত সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্যপ্রণালী ও নির্বাচনের জন্য mother law হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। বর্তমান স্তর বিশেষের আইনে যাইই থাকুক, নতুন আইন পাশ হওয়ার পর ঐ বিধানসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ২০১৪ সনের পর যখন যে স্তরে নির্বাচন হবে তা নতুন আইন "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (গঠন, নির্বাচন ও কার্যপ্রণালী) আইন-২০১৩" অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালচিত হবে। প্রতিটি স্তরের জন্য একীভূত একটি কোড অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

(১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (গঠন, নির্বাচন ও কার্যপ্রণালী) আইন-২০১৩ প্রতিটি স্তর ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ বা মাদার ল' হিসাবে গণ্য হবে। এ আইনের অধীনে পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করে প্রতিটি স্তর গঠন করা হবে।

(২) এ আইন পাশ হবার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আইনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে পৃথিবীর অনেক দেশ (ভারত, ফিলিপাইনস্ ও দক্ষিণ আফ্রিকা) এর মত সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। যেখানে প্রশাসন, অর্থায়ন এবং কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট ফর্মুলার ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হবে।

**এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়াংশের বিশেষ কিছু সুপারিশ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা সুশাসন প্রকল্পের সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়। এ লেখার সকল মতামত লেখকের নিজস্ব, অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ মতামতের জন্য দায়ী হবে না।*